ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 06. No. 01. December 2011

সাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম-ব্যবসায় ও ধর্মীয় রাজনীতি: প্রসঙ্গ আহমদ ছফার কথাসাহিত্য

পুরনজিত মহালদার*

সারসংক্ষেপ: সাম্প্রদায়িক সমস্যা মানব জাতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ড় বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন মাধ্যমে জনসমাজে বিরাজ করে। বিশেষ করে ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে সাম্প্রদায়িক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল মুখোশের আড়ালে তাঁদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে থাকে। সাধারণ মানুষের চেতনায় ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার অটুট থাকায় তাঁদের দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার চারিত্র্য নির্ধারণ সচরাচর সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে সাম্প্রদায়িকতা অক্টোপাসের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে সমাজস্থিত মানুষের চৈতন্যকে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে কলুষিত হয়ে ওঠে শান্ড়িপূর্ণ সমাজের আবহ। অজ্ঞানতা, কুপ্রথা, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আটকে থাকা মানুষের জীবনে সাম্প্রদায়িকতা আসন গেড়ে বসে অনন্ড়কালের জন্যে। আলোচ্য প্রবন্ধে আহমদ ছফার কথাসাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম-ব্যবসায় ও ধর্মীয় রাজনীতির নানাবিধ দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইংরেজদের আগমনে ভারতবর্ষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। ভারতবর্ষের হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ ইংরেজদের সাহচর্যে এসে শিক্ষাদীক্ষা, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে অনেকখানি এগিয়ে যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় সে সময় নিজেদের পশ্চাদমুখিতার কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। 'হিন্দুদের এই অগ্রসর পদক্ষেপ এবং মুসলমানদের পশ্চাদমুখিতাই রচনা করল সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন সময়েই সারা দেশ সমানভাবে অগ্রবর্তী হয় না। আয় এবং সম্পদও সকলের সমান থাকে না। প্রত্যেক দেশেই এক শ্রেণী অগ্রসর এবং অন্য এক শ্রেণী পশ্চাদপদ থাকে।'[১] হিন্দু সম্প্রদায় এসময় জাগরণের মধ্য দিয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সব দিক দিয়ে অগ্রসর হয়। একপর্যায়ে তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের সাথে আর একসুরে কথা না বলে বরঞ্চ সর্বক্ষেত্রে বিরোধিতা শুরু করে। এই বিরোধিতার সূত্র ধরে ভারতবর্ষে জন্ম নেয় জাতীয় চেতনা। প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' (১৮৮৫)। 'আধুনিক হিন্দু মধ্যবিত্তের উত্থানের মুহূর্তে অন্য কারো সাথে তার কোন রেষারেষি ছিল না। ইংরেজ

* গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ছিল তার বহু উর্ধ্বে। মুসলমান তার থেকে ছিল অনেক পশ্চাতে। প্রায় এক শতাব্দী ধরে তাদের প্রগতি তাই থাকল অব্যাহত। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনি ঘটল না। ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলমান মধ্যবিত্তের উত্থান পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকল হিন্দু মধ্যবিত্তের দ্বারা। শুরু হল তাদের প্রতিযোগিতার পালা।'[২] এই প্রতিযোগিতার মাঠে নেমে মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের স্বতন্ত্র দল গঠনের প্রচেষ্টা শুরু করে। তাঁদের এই প্রয়াসের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম লীগ' (১৯০৬)। ব্রিটিশ সরকার নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, রেষারেষিকে উস্কে দেয়। ব্রিটিশ সরকারের প্রধান লক্ষ্য ও কাজ ছিল ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে কোন আন্দোলনকে যে কোন উপায়ে দমিয়ে রাখা। এরপর শুরু হয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ধর্মীয় রাজনীতি। ধর্মনিরপেক্ষতার আর কোন চিহ্ন এরপর ভারতবর্ষের রাজনীতিতে লক্ষ্য করা যায় না। 'সাম্প্রদায়িকতার মাহাত্ম্যে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধর্ম সম্প্রদায় পরিণত হল জাতিতে এবং মুসলমানেরাই হলেন এই জাতিতত্ত্বের প্রধান ব্যাখ্যাকার। এর কারণ হিন্দু মধ্যবিত্তের সাম্প্রদায়িক শ্রেণীস্বার্থ উদ্ধারের জন্য অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সংখ্যাগরিষ্ট সম্প্রদায় হিসাবে পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মুসলমান মধ্যবিত্তের সে প্রয়োজন ছিল।'[৩] মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মরিয়া হয়ে ওঠে। উপায় হিসেবে গৃহীত হয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার ভেদনীতি। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ উপস্থাপন করেন দ্বিজাতি তত্ত্বের খাড়া। 'কায়েদে আজম জিন্নাহ্র দ্বিজাতি তত্ত্বের এই হল সুনিশ্চিত অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। পাকিস্ড়ানের স্বপ্ন সত্য অর্থে ধর্মগতপ্রাণ ভারতীয় মুসলমানদের ইসলামী জীবন যাপনের স্বপ্ন নয়। এ স্বপ্ন মূলত মুসলমান মধ্যবিত্তের শ্রেণীস্বার্থ প্রতিষ্ঠার।'[৪] শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত হয় ভারতবর্ষ। কিন্তু বিভাজিত হওয়ার পূর্বে ঘটে যায় একাধিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক চিন্ড়া-চেতনার চরম পরিণতি হিসেবে দেখা দেয় ঊনিশশো ছেচলিণ্ঢশের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই সাম্প্রদায়িক হানাহানির শিকার হয় অসংখ্য নিরীহ জনতা। পাকিস্ড়ান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্ড়ানি শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ধর্মীয় রাজনীতির দূরভিসন্ধি সম্পর্কে অল্পদিনের মধ্যেই পূর্বপাকিস্ড়ানের অধিকাংশ বাঙালি সচেতন হয়ে ওঠে।

'পাকিস্ড়ান হওয়ার পরপরই এদেশে একটা সাংস্কৃতিক 'এলিট' শ্রেণী সৃষ্টি হতে থাকে। দুনিয়ার বুকে পাকিস্ড়ান একটা বিসংগত রাষ্ট্র—এই রাষ্ট্রের সরকারী দর্শন ও বিসংগত। ইসলাম, মুসলিম জাতীয়তা, ইসলামী রাষ্ট্র এসব গালভরা মনোহর মিথ্যে বুলিই ছিলো পাকিস্ড়ানবাদী বুদ্ধিজীবীদের অত্যন্ড় আদরের জিনিস।'[৫] পাকিস্ড়ান প্রতিষ্ঠার পরপরই বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর পাকিস্ড়ানি শোষকগোষ্ঠীর ক্রমাগত নিষ্ঠুর শোষণ-শাসনের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। দীর্ঘ দুই দশকের শোষণে অতীষ্ঠ হয়ে বাঙালিরা পাকিস্ড়ানি ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো থেকে মুক্তির আশায় পাকিস্ড়ানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ নির্ধারিত হয়। কিন্তু এই নীতিগুলো আদৌ কার্যকর হয়নি। স্বাধীনতার পর পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণা, ধর্মান্ধতা স্থায়ী রূপ

ধারণ করে। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রত্যয় সংবিধান থেকে দূর হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হবার পর জিয়াউর রহমানের শাসনামলে 'সংবিধানের শিরোভাগে বিসমিলণ্ঢাহির রাহমানির রহিম এসে স্থান করে নিলো। রাষ্ট্রের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেলো। জিয়াউর রহমানের পর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় এসে ইসলাম ধর্মকে বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে বসলেন।'[৬] প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি বা দল সমাজে পুণর্বাসিত হয়ে তাঁদের পুরনো হিসেব নতুন করে শুর" করে। 'মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসমূহ একে একে ধূলোয় গড়াগড়ি খেতে লাগলো। সমস্ড় পরিবেশটা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে বিষিয়ে তোলা হলো। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের প্রতাপ অধিকতরো বিস্ড়ৃত হয়ে পড়লো। সংস্কৃতির গতিপথটার মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য নিত্যনতুন কৌশলের উদ্ভাবন করা হতে থাকলো। বাঙালীত্বের বিপরীতে মুসলমান পরিচয়টা খুঁচিয়ে বের করার জন্য তাদের চেষ্টার অন্ড় রইলো না।'[৭] প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির এই প্রয়াস আলোর মুখ দেখতে পায়। 'মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে যে দেশটি জন্ম নিয়েছে তার প্রকৃত পরিচয় মুছে দিয়ে দেশটিকে আবার নতুন পাকিস্ড়ানে পরিণত করার সর্বাত্মক পাঁয়তারা করতে থাকলো। সমাজের ওপর হতে তলা পর্যন্ড় সর্বত্র পশ্চাদপদ ধারণা রাজ্যপাট বিস্ড়ার করতে আরম্ভ করলো।'[৮] বাংলাদেশ পুণরায় সাম্প্রদায়িকতার কক্ষপথে আবর্তন শুর" করলো। এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালে 'জিয়াউর রহমানের বিধবা স্ত্রী মিসেস জিয়া বি.এন.পির চেয়ারপার্সন হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর দলের নির্বাচনে সফলতা হিসেবে ধর্মীয় রাজনীতিকেই তিনি গ্রহণ করেন। স্বামীর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী যে তৎপরতা, পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদির যে বীজ তিনি বপন করেন মিসেস জিয়া তাকে মহীরূহ দানে তৎপর হন।'[৯] ফলে ঊনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহ প্রকাশ্যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের পুরনো কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে আরম্ভ করে।

বিশ শতকের প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় রাজনীতির পাশাপাশি ধর্ম-ব্যবসায় একটি উলেণ্ঢখযোগ্য বিষয়। হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় গোড়ামি, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের পথ বেয়ে সমাজ শরীরে প্রবেশ করে ধর্ম-ব্যবসায়। ধর্ম নিয়ে পারস্পরিক বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব, হানাহানি প্রবহমান জীবনকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। ধর্মের ধ্বজাধারী অসাধু ব্যক্তি, দল ধর্মের নামে তাঁদের সকল প্রকার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক বিকাশের জন্য সংস্কৃতির বিকাশ অপরিহার্য। বৈষম্য দূর করে সমাজ জীবনে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ সাধন। 'ধর্মীয় সংস্কার এমন জিনিস যা সোজা জিনিসকে বাঁকা দেখতে বাধ্য করে। এই বাঁকা দেখতে বাধ্য হয়েছিলো বলেই ভারত দ্বি-খ"িত হয়েছে।'[১০] রাজনীতি ও সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক। সমাজের ভেতর থেকে ধর্মীয় গোড়ামী, ধর্মীয় রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে না পারলে সংস্কৃতির বিকাশ আদৌ সম্ভব নয়। বাঙালি সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি এক নয়। 'পাকিস্ড়ান আমলে ধর্মবিশ্বাসের ঐক্যবোধের পরিপূরক হিসাবে মুসলিম সংস্কৃতিকে অবলম্বন করা হয়েছিল, বাঙালি সংস্কৃতিকে কোনো গুর"ত্ব দেয়া হয়নি। বরং বাঙালি সংস্কৃতির সাম্প্রদায়িক ব্যবহার হয়েছিল, বাঙালি সংস্কৃতিকে তাঁরা হিন্দুর বা হিন্দু প্রভাবিত বলে ধরে নিয়েছিল।'[১১]

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চেতনা মূলত ধর্ম চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। আর তাতে ইন্ধন বা সহযোগিতা করে চলেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র। ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বিরোধ, অবিশ্বাস, এবং ভুল বোঝাবুঝির অবসান সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

আহমদ ছফার কথাসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের অন্ধ ধর্মীয় ভাবাবেগ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম-ব্যবসায় ও ধর্মীয় রাজনীতির উলেণ্ঢখ পাওয়া যায়। একজন উদার, অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ লেখক হিসেবে তিনি তাঁর রচনায় এ সমস্ড় বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে। ধর্মীয় দ্বন্দ্ব-কলহের জের ধরে মানুষের মধ্যে যে পাশবিক চেতনার জন্ম এবং তার দ্বারা সৃষ্ট অবর্ণনীয় অমানবিকতার বাস্ড়ব চিত্র আহমদ ছফার কথাসাহিত্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সূর্য তুমি সাথী উপন্যাসে গ্রামীণ শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য রূপায়ণের পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে শ্রেণিগত জীবনের মূল সংকটের সঙ্গে সূক্ষ্ম কলাকুশলতায় সংশিণ্ঢষ্ট করেছেন। এছাড়াও নিম্নবিত্ত মানুষের হতাশাপূর্ণ জীবনে উচ্চশ্রেণির মানুষ শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকে কিভাবে ব্যবহার করে লেখক তা স্বল্প পরিসরে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে অভাব, দুঃখ, নির্যাতন, উপবাস থেকে মুক্তি পাবার আশায় তেজেন আত্মহত্যা করলে মুসলণ্ঢী ছতুর বাপ তসবীহ্ টিপতে টিপতে মন্ড়ব্য করেছে: 'কাফের এনে তো যাইত দোযখত্। এক্কই কথা। ফি নারে জাহান্নামে হালেদিনা।'[১২] ছতুর বাপের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্ড় হিন্দুই কাফের, মৃত্যুর পর তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। ধর্মান্ড়রিত হরিমোহনের সন্ড়ান এই উপন্যাসের নায়ক হাসিমকে ছতুর বাপ মসজিদে না গেলে পাড়াছাড়া করার হুশিয়ারী উচ্চারণ করে। অথচ ছতুর বাপের এই সাম্প্রদায়িক চেতনার পেছনে লুকিয়ে আছে অন্য বাস্ড়বতা। গ্রামের মাতব্বর খলু, উঠতি ধনী জাহেদ বকসু, চেয়ারম্যান কানা আফজলের সকল রকমের অন্যায়ের দিকে ছতুর বাপের ধর্মীয় বিধান হেলে থাকে। গ্রামে ওলাউঠায় অসংখ্য মানুষ মারা যাওয়ায় কৃষক সমিতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলে তাঁদের সম্পর্কে 'ছতুর বাপ তসবীহ টিপতে টিপতে নবীর দোকানে বসে কতো খারাপ কথা বলেছে। ফয়েজ মস্ড়ান এদেরকে কাফের বলেছে। রামাই প"িত কাঁধের পৈতা দুলিয়ে বলেছে, সব ব্যাটা গাজাখোঁর - পাঁড় মাতাল।'[১৩] হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরাজিত সাম্প্রদায়িক রেষারেষির বাস্ড়বতা উঠে এসেছে হাসিমের পিতার ধর্মান্ড়রিত হওয়ার ঘটনায়। লেখকের বর্ণনায়:

> দশ গেরামের মুসলমান তাকে কেন্দ্র করে উৎসবে মেতে উঠেছিলো। বাজী পুড়িয়ে ইসলামের জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছিলো। হিন্দু ধর্মের অসারতা নিয়ে জোর বক্তৃতা দিয়েছিলো। গর" জবাই করে জেয়াফত দিয়েছিলো। ইচ্ছে ছিলো হিন্দুদের মাথা চির জীবনের জন্য হেঁট করে দেবে।'[১৪]

আহমদ ছফার এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি ঘটনা যেন বাস্ড়বেরই হুবহু অনুকরণ। বাস্ড়বতার আলোকেই তিনি হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা, অনুদারতাকে ধারণ করেছেন। পাশাপাশি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষ কত নিষ্ঠুর, রূঢ়,

অমানবিক হয়ে উঠতে পারে। ধর্মকে মানুষ কিভাবে প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে, ধর্ম পালন কিভাবে ধর্ম ব্যবসায়ে রূপান্ড়রিত হয় তা লেখক সূক্ষ্ম রেখায় অঙ্কন করেছেন। রফিক সওদাগরের হজ থেকে ফেরার প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান কানা আফজল বলেছে:

> রফিক মিয়া কোয়াল্যা নইলে কোয়াল্যা কন্? গাইডের টেঁয়া মোডেও খরচ ন অয়। সতের ভরি সোনা আন্যে মক্কাথুন। আর ঘড়ি অন্যান্য জিনিস যা আন্যে না, হাজার টেঁয়ার মতো লাভ অইয়ে।'[১৫]

ঔপন্যাসিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাবের চিত্র অঙ্কন করেছেন হাজেরার আট বছরের ছেলে মতির ওলাউঠায় মারা যাওয়ার প্রেক্ষাপটে। মতির খেলার সাথী মনমোহন আচার্যের ছোট ছেলে শোভনকে তাঁর মা মৃত মতিকে দেখতে যেতে নিষেধ করলে শোভন বলেছে:

> সব মানুষ এক মানুষ নয় ক্যা মা? ... ধর্ম দু'রকম ক্যা?[১৬]

হাসিমের বৃদ্ধা দাদী শৈলবালা রক্তের টানে, হৃদয়ের আকর্ষণে সুফিয়ার মরামুখ দেখতে এসেও রাস্ড়ার মাঝে থমকে দাঁড়ায়। কারণ শৈলবালা জানে হিন্দুরা মুসলমানের মৃতদেহ দেখতে যেতে পারে না। তাঁদের দেখার রেওয়াজ নেই। বৃদ্ধা ধর্মীয় সংস্কার আর অন্ড়রের টানের টানাপোড়েনে পড়ে জীবনে প্রথমবারের মতো 'মনে মনে আকাশের ভগবান কে' দোষী করে বলেছে :

> ভগবান, দুই ধর্ম কিয়রলায় ছিরজন গরলি।[১৭]

সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে সমাজের ভাঁজে ভাঁজে ক্লেদ পঙ্কিলতা জমে ওঠে। ঊনিশশো সাতচলিণ্ডশের দেশভাগের পূর্বে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান প্রাণ হারায়, তারপর শুর“ হয়, দেশত্যাগের পালা। 'রিফ্যুজি' পাড়ার বুড়ি হাসিমকে বলেছে তাঁর স্বামী হারানোর ঘটনা:

> বাপজান, রোগ-ব্যারাম কিচ্ছু নয়। জ্যান্ড় মানুষটাকে মেরে ফেললো। ... হিন্দুরা।[১৮]

বুড়ির এই সংলাপের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বৈরি মনোভাবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে লেখক এখানে একই সঙ্গে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর টানাপোড়েনকে রূপদান করেছেন। বুড়ি ও হাসিমের সংলাপের মাঝে লেখক তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। লেখকের ভাষায় :

> কেন এ যাওয়া আসা? হিন্দুরা পাকিস্ড়ান থেকে হিন্দুস্ড়ানে যায়, হিন্দুস্ড়ান থেকে মুসলমানরাও বা আসে কেন? কেন আসে? কেন যায়?[১৯]

লেখকের এই প্রশ্ন সাম্প্রদায়িকতার বির“দ্ধে, ধর্মীয় রাজনীতির বির“দ্ধে। *সূর্য তুমি সাথী* উপন্যাসে এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই আহমদ ছফা অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

একজন আলি কেনানের উত্থান-পতন উপন্যাসে দেখতে পাই ধর্ম ব্যবসায়ের পণ্যে পরিণত হয়েছে। সেই সাথে রাজনৈতিক দল বা সরকার ক্ষমতার জন্য ধর্ম ব্যবসায়ীদের সর্বাত্মক সাহায্য করেছে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আলি কেনান। আলি কেনান 'নিজের দাপট প্রতিষ্ঠার জন্যে উদ্ভট উদ্ভট উদ্ভাবন, নিজের ব্যক্তিত্ব আরোপের জন্যে ধর্মের অদ্ভূত ব্যবহার এবং আখড়া সাজিয়ে পয়সা কামানো ও ইচ্ছা মতো যৌন সঙ্গম করা - এসবের মধ্যে দিয়ে আলী কেনান পরিণত হয় আমাদের একজন চেনা মানুষে। তার তৎপরতা ও আচরণে এবং তার কামনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় সে হয়ে ওঠে দাপটওয়ালা কোনো মানুষের ক্যারিকেচার। এরকম ক্যারিকেচার করার শক্তি ছফার অসাধারণ'।[২০] পূর্ব পাকিস্ড়ানের গভর্নরের খাস পিয়নের চাকুরি হারিয়ে, গভর্নর হাউজ থেকে বিতাড়িত হয়ে অস্ড়িত্বহীন হয়ে পড়ে আলি কেনান। অস্ড়িত্বরক্ষার তাগিদ থেকেই আলি কেনান বেছে নেয় মাজার ব্যবসায়। ফুলতলির একটি ভাঙা কবরের চারপাশে চারটি ত্রিকোণাকার লাল নিশান টাঙিয়ে এবং কবরটিকে আপাদমস্ড়ক লাল শালুতে আবৃত করে শুর“ হয় আলি কেনানের যাত্রা। আলি কেনানের আবির্ভাবকে স্থানীয় মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই মেনে নেয়। কারণ 'দরবেশ ফকির ওরা তো সবখানে মাটি ফুঁড়ে জন্মায় আর মানুষ তাদের মেনে নিতে অভ্যস্ড়।'[২১] আলি কেনানের মাজার ব্যবসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। আলি কেনান গানের দল তৈরি করে। দলবল নিয়ে সদরঘাট, বাংলাবাজার, ইসলামপুর, নওয়াবপুর, টিপু সুলতান রোড ও নারিন্দাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে চাঁদা তোলা তাঁর নিয়মিত কাজে পরিণত হয়। আলি কেনানের সম্প্রসারণশীল চিন্তা-ভাবনা এবং প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পীরের বেশে মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে অর্থোপার্জন নতুন কোন ঘটনা নয়। আহমদ ছফা এই বিষয়টিকেই আলি কেনান চরিত্রের মাধ্যমে শিল্পরূপ দিয়েছেন। আলি কেনান তাঁর সমূহ কর্মকা-ের মাধ্যমে একটা মিথ্যার রাজত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। সেটা সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারে। 'পাছায় লাথি মারা, ডান হাত ডুবিয়ে পানি পড়া এসব করে অধিকদূর যাওয়া সম্ভব নয়। ভদ্র শিক্ষিত মার্জিত র“চির মানুষেরা তার কাছে আসতে আরম্ভ করেছে। তাদের চাহিদা, পছন্দ এবং র“চি মোতাবেক অনেক কিছু পাল্টাতে হবে।'[২২] আলি কেনান তাঁর কৌশলের দ্বারা ধীরে ধীরে হাইকোর্টের মাজার, নিমতলীর মাজার, মিরপুরের শাহ আলি বাবার মাজার দখল করে ফেলে। মাজার ব্যবসার বিষয়ে দিন দিন তাঁর অভিজ্ঞতার ভা-ার সমৃদ্ধ হয়। চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্ড়মী মাজার, আমানত শাহের মাজার, মাইজ ভা-ার মাজার, সিলেটের শাহজালাল বাবার মাজার, খুলনার খানজাহান আলী বাবার মাজার, রাজশাহীর শাহ্ মখদুমের মাজার এবং রাজধানীর বিভিন্ন মাজারে ঘুরে বেড়ানো মানুষের সংস্পর্শে এসে আলি কেনানের প্রখর কা-জ্ঞান তাঁকে মাজারের প্রকৃত বাস্ড়বতা সম্পর্কে মনোযোগী করে তোলে। আলি কেনান দেখে:

> এক একটি মাজার বছরে লক্ষ লক্ষ টাকায় নিলাম হয়, হাট বাজার ঘাটের মতো। যে সর্বোচ্চ অর্থ প্রদান করতে পারে সে বছরের সমস্ড় টাকা-পয়সা আদায় করার দায়িত্ব পেয়ে যায়। এদিক দিয়ে দেখলে একেকটা মাজার অন্য দশটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চাইতে আলাদা নয়। তফাৎ শুধু এটুকু যে অন্য ব্যবসায়ে মূলধন মারা যাওয়ার ঝুকি আছে, মাজার ব্যবসায়ে তা নেই। মাজারে মানুষ আসবেই। মানুষ আসবে কারণ সে দুর্বল অসহায় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী।[২৩]

ধর্ম ব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচনে আহমদ ছফা আলি কেনান চরিত্র নির্মাণ করেছেন। আলি কেনানের 'পীর সেজে রাজধানীর মাজারে মাজারে দোর্দণ্ড দাপটে আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা এবং ব্যর্থতা এক ধরনের ব্যঙ্গাত্মক ফ্যান্টাসিকল্পনা বটে কিন্তু এতে অশিক্ষিত দরিদ্র আলী কেনানের ক্ষমতাপ্রদর্শনের উদগ্রতা সমস্ত রকমের সুরুচি-ভব্যতাকে এক হাত দেখে নিয়ে ছাড়ে।'[২৪] মাজার দখলকে কেন্দ্র করে শরিকরা এবং মুরিদরা খুন, জখম, মামলা-মোকদ্দমা করতে পিছপা হয়না। কারণ মাজারকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে লাভজনক ব্যবসায়। মাজারে আসা মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির ক্ষমতালোভী মানুষ রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় মাজারকে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত করে। লেখকের বর্ণনায় মাজার ব্যবসার বাস্তবতা উন্মোচিত হয়েছে :

> সারাদিন মাজারের দান বাক্সে যতো টাকা পড়ে, সন্ধ্যেবেলা সে টাকা নিলামকার মহাজনের বাড়িতে চলে যায়। যতো লোক রক্ষণাবেক্ষণে থাকে সব মাইনে করা কর্মচারী, জিলিপি, বসগোলণ্ডা, আগরবাতি, মোমবাতি, গোলাপজল যতো মাজারে আসে সব পিছনের দরজা দিয়ে ঘুরে আবার দোকানে চলে যায়। একেক দিনের মধ্যে এক সের মিষ্টি যে কতোবার কেনা বেচা হয় কেউ হিসেব রাখতে পারে না। কেবল বিক্রির অর্থটাই জমা হয় মহাজনের সিন্ধুকে। প্রতিটি মাজার নিজের নিয়ম কানুনে চলে। এখানে সরকারের আইন বিশেষ কাজ করে না। গাঁজা, চরস, সিদ্ধি এসব অবাধে কেনাবেচা হয়। পুলিশের খপ্পরে পড়ার কোনো আশঙ্কা নেই। সে কারণে তাদের নিলামকারকে চড়াহারে কমিশন দিতে হয়।[২৫]

আলি কেনান মনে করে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত মাজারের পেছনে তাঁর মতো কোন ত্বরিতকর্মা মানুষের ফন্দিফিকিরি লুকিয়ে থাকে। মাজারের মধ্যে প্রকৃত কোন সত্য নেই। সবই মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ফকিরি করার ভান করে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা একটা উত্তম কৌশল মাত্র। আলি কেনান চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখকের পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মুখোশ উন্মোচনের প্রয়াস লক্ষণীয়। ধর্মীয় লেবাস ধারণ করে ফুলতলির ভাঙা কবরকে লাল নিশান আর লাল সালু দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণী করে গড়ে তুলে তাকে খোরাসানী বাবার মাজার হিসেবে পরিচিত করার দূরভিসন্ধির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম প্রতীকী ব্যঞ্জনা লুকিয়ে আছে। শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মকে পুঁজি করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পূর্বপাকিস্তানের বাঙালিদের দীর্ঘ দুই দশক ধরে শোষণের সাথে আলি কেনানের মাজারকেন্দ্রিক ধর্মীয় আচার-আচরণের মাধ্যমে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও মাজারপূজারী মুসলিমদেরকে বশীভূত করার সুপরিকল্পিত প্রয়াসের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। 'ইতঃপূর্বে অবশ্য সৈয়দ ওয়ালীউলণ্ডাহর উপন্যাসে দুই পীরের সংঘর্ষ, রক্তারক্তি আমরা দেখেছি। বাংলাদেশের সমাজ 'লালসালুর' মহব্বতনগরের মজিদকে তার গ্রামীণ মাটির ঢিবি থেকে এবং আওয়ালপুরের পীরকে প্রবীণ বটবৃক্ষ থেকে গ্রামগঞ্জে ও শহরের মসৃণ অবস্থানে এসে গেড়ে বসবার পথ করে দিয়েছে। সঙ্গে রয়েছে আরও-আরও 'নগর' ও 'পুর' -এর পীরগণ। বলা যায় 'লালসালুর' যেখানে শেষ আলী কেনানের সেখানে শুরু এবং এর সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতিরও একটা যোগসূত্র স্থাপন করেছে উপন্যাসটি।'[২৬]

ঊনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশ মার্চ থেকে শুরু করে ঊনিশশো পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়া পর্যন্ত সময়ে আলি কেনানকে ঔপন্যাসিক

বঙ্গবন্ধুর জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু অভাবিত ঘটনার প্রায় সমান্তরালে অঙ্কন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ববাংলায় থাকতে পারেননি। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের দ্বারা গ্রেফতার হয়ে পাকিস্তানের কারাগারে আটক ছিলেন। আলি কেনান 'যুদ্ধের এই ন মাস কোথায় ছিলো, কি অবস্থায় ছিলো কেউ তা জানেনা।'[২৭] মুক্তিযুদ্ধ শেষে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে দেশবাসী তাঁকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা দেন আর 'নিমবাগান এলাকার মানুষ আলি কেনানকে বীরের সম্মান দিয়েই গ্রহণ করলো।'[২৮] আলি কেনানও নিমবাগানের মানুষের কর্মকাণ্ডকে একান্তই যুক্তিসঙ্গত মনে করলো। এরপর আলি কেনান জয়বাংলার দরবেশ সেজে নতুন উদ্যমে প্রভাব বিস্তার শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যে আলি কেনান আস্ত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আলি কেনানের কাজে সহায়তা করে সরকার। আলি কেনানের আস্তানায় 'মদ চলে, গাঁজা চলে। শিল্পী আসে, কবি আসে, সাংবাদিক আসে। সকলেই আলি কেনানকে প্রেরণার একটা গভীর উৎস হিসেবে ধরে নিয়েছে। গুজব রটেছে, ভদ্রঘরের মেয়েরাও আলি কেনানের ওখানে গিয়ে গাঁজা টানে।'[২৯] এ সম্পর্কে আহমদ ছফার মন্তব্য স্মরণযোগ্য: 'আমাদের এই দেশে ধর্মের নামে ধর্মধ্বাজীরা রায়ট করে। জ্ঞানের নামে পণ্ডিত নামধারী মানুষেরা চাতুরী করে, সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলের নামে কবি-সাহিত্যিক এবং চিন্তাশীল মানুষরা চাতুরালী করে। রাজনীতির নামে লোক ঠকায়। কুসংস্কার মানুষের মনে বন রচনা করেছে। কাপালিক প্রবৃত্তির গোঁড়ায় জল ঢেলে, সার দিয়ে রাজনীতির সেনাপতিবৃন্দ খেয়া ঘাট পার হবার জন্য নিত্যনতুন চকচকে কৌশল রচনা করেন।'[৩০] উপন্যাসেও দেখা যায় সরকারের হোম মিনিস্টার কৌশল রচনা করেছেন। শহরের এসপি আলি কেনানকে এ্যারেস্ট করায় 'শুরু হলো হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড। হোমরা চোমরা ব্যক্তিরা তাঁর অফিসে টেলিফোন করতে থাকেন। নিমবাগান থেকে মাঝারি ধরনের একটা মিছিল বের হলো। মিছিলকারীরা হোম মিনিস্টারের বাড়ির সামনে বসে থাকে। বাধ্য হয়ে হোম মিনিস্টারকে মিছিলকারীদের সঙ্গে দেখা করতে হয়। তিনি আশ্বাস দেন যে আজই দরবেশকে ছেড়ে দেবেন এবং অনতিবিলম্বে এসপির বদলির অর্ডার ইস্যু করবেন।'[৩১] সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে আলি কেনান জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসে। ফলে আলি কেনানের দৌরাত্ম্য আগের মতোই বজায় থাকে। 'ক্যাওস' বা বিশৃঙ্খলা একটি জাতির সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে বিরাজ করলে তার বহিঃপ্রকাশ কী হতে পারে তার দৃষ্টান্ত উক্ত উপন্যাস।'[৩২] ধর্মকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করলে কিংবা তাতে রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজশক্তির সম্মিলন ঘটলে সমাজের অবক্ষয় অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। আহমদ ছফা তা খুব গভীরভাবে অনুধাবন করে *একজন আলি কেনানের উত্থান-পতন* উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন।

মরণ বিলাস উপন্যাসে মাজার প্রসঙ্গ এসেছে ভিন্ন মাত্রায়। অসুস্থ মন্ত্রী ফজলে ইলাহির বর্ণনায় তাঁর পিতার নেতৃত্বে সংঘটিত মাজারকেন্দ্রিক হানাহানির চিত্র উঠে এসেছে। মন্ত্রীর দেওবন্দ পাশ করা মশহুর আলেম পিতা তাঁদের গ্রাম থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত একটি মাজারের মুরিদদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, 'গোরপূজা হারাম। যেসব মুসলমান নামধারী মানুষ রোজা নামাজ ঠিকমতো পালন করে না, গান বাজনা করে, পীরকে খোদার আসনে বসিয়ে ইবাদত করে তারা মুশারিক (মুশরিক) এবং কাফেরদের চাইতেও অধম।

নবী করিমের ইসলাম যদি জিন্দা রাখতে হয়, এই মুহূর্তে মাজারে আগুন লাগিয়ে এই সমস্ড় লা শরিয়তি কর্মকাে র শেষ চিহ্ন পর্যন্ড় মুছে ফেলতে হবে।'[৩৩] যে কথা সেই কাজ। মন্ত্রীর পিতার আহবানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মুসলমান মশাল হাতে মাজার ও পীরের মুরীদদের প্রতিহত করতে ছুটে আসে। ধর্মীয় দ্বন্দ্ব, রেষারেষির কারণে ঘটে পাশবিক হত্যাকা । মন্ত্রীর বর্ণনায়:

> ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে পীর সাহেবের মাজার, তাঁর বংশধরদের থাকার ঘর সব পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলো। এই উন্মত্ত জনম লীকে বাধা দিতে গিয়ে পীর সাহেবের তিনজন শিষ্যকে প্রাণ দিতে হয়েছিলো। আহত হয়েছিলো অনেক বেশি। আবার বাবা ধর্মযুদ্ধে জয়লাভ করে বিশাল জনসমষ্টির শিরোভাগে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুষ্টি প্রসারিত করে উচ্চারণ করেছিলেন, ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায়, জনম লী বজ্র নির্ঘোষে সাড়া দিয়ে বাবার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন। হর কারবালা কি বাদ।[৩৪]

ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলমান সম্প্রদায় ধর্মীয় গ ীর বাইরে না আসায় হিন্দুদের তুলনায় অনেকাংশে পিছিয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ওপরে ওঠার প্রতিযোগিতায় উভয় সম্পদায়ের মধ্যে দেখা দেয় রেষারেষি, হানাহানি। ধর্মকে ইস্যু করে হিন্দু-মুসলমানরা বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের দিকে ধাবিত হয়। মন্ত্রী ফজলে ইলাহি তাঁর স্কুলে সরস্বতী পূজা ও ঈদে মিলাদুন্নবী পালনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বের বর্ণনা করেছেন এভাবে:

> শিক্ষাহীন, সংস্কৃতিহীন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের মনের ভেতরে একটা ভিন্নরকম অনুভূতি কাজ করে যাচ্ছিলো। তোমাকে বলেছি, গ্রামে শিক্ষাদীক্ষায় অর্থ প্রতিপত্তিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেকাংশে এগিয়ে ছিলো। গ্রামে ডাক্তার কবিরাজরা ছিলো হিন্দু, রোগীরা মুসলমান। উকিল মোক্তার হিন্দু, মক্কেল মুসলমান। মহাজন হিন্দু, খাতক মুসলমান। জমিদার হিন্দু, প্রজা মুসলমান। অবশ্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট গরিব খেটে খাওয়া মানুষ ছিলো। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ বিভেদ নিয়ে চিন্ড়া করার চাইতে পেট চালানো সমস্যাই ছিলো তাদের প্রবল সমস্যা। তবু আমি বলবো মাওলা বক্স, ধর্ম বড় অদ্ভুত জিনিস। দেখা গেছে কোনো কোনো সময় মানুষকে অমানুষ পাষ র ভূমিকায় নামাতে ধর্ম যথেষ্ট রকম অনুপ্রেরণা দিয়েছে।[৩৫]

আহমদ ছফার মতে, 'রাজনৈতিক সংগ্রামকে স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নেয়ার প্রয়োজনের সঙ্গে সংস্কৃতির সংগ্রামকেও এগিয়ে নিতে হবে। সুস্থ রাজনৈতিক সংগ্রাম ছাড়া সুস্থ সংস্কৃতি কখনো আশা করা যায় না। সুস্থ সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে যাঁরা আশা রাখেন তাঁদের গৌণ কাজ হওয়া উচিত রাজনৈতিক সংগ্রামকে বিকশিত হতে সাহায্য করা।'[৩৬] *মরণ বিলাস* উপন্যাসে দেখা যায় মন্ত্রী ফজলে ইলাহি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যেকার রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগ দেয়। কিন্তু সে সংগ্রাম সুস্থ রাজনৈতিক সংগ্রাম ছিল না। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রেষারেষির সূত্র ধরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে জড়িত হয়ে ফজলে এলাহি তাঁর বিদ্যালয়ের কংগ্রেসপন্থী, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শানুসারী প্রধান শিক্ষককে পুড়িয়ে মারতে বাকিকে সাহায্য করেছে। মন্ত্রী ঊনিশশো ছেচলিণ্ডশের 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙ' -এ অংশ

নিয়ে হিন্দুর রক্তে হাত রাঙিয়েছে। পাকিস্ড়ান প্রতিষ্ঠার পর কিংবা স্বাধীন বাংলাদেশেও মন্ত্রী ফজলে ইলাহি রাজনীতির সাথে সংশিণ্টষ্ট থেকেছে। সুতরাং ধর্মীয় রাজনীতি বা অসুস্থ রাজনীতির বৃত্তে বন্দী ফজলে ইলাহির কাছ থেকে সুস্থ সংস্কৃতি আশা করা যায় না। এই তথ্যই আহমদ ছফা *মরণ বিলাস* উপন্যাসে প্রদান করেছেন।

গাভী বৃত্তান্ড় উপন্যাসে আহমদ ছফা আরো বিস্ড়ৃত ও ব্যাপক আকারে তুলে ধরেছেন ধর্মীয় ঘেরাটোপে বন্দী মানুষের জীবন বাস্ড়বতা। *গাভী বৃত্তান্ড়* 'একজন আলি কেনানের *উত্থান-পতন* -এর অপর পিঠ। ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রন, চরিত্রহীনতা, সুবিধাবাদ ব্যক্তির এইসব বিশেষত্ব উভয় উপন্যাসে যথেষ্ট সামাজিকতার মর্যাদায় অভিষিক্ত। মাজারকেন্দ্রিক আলি কেনান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা সর্ব্বোচ শিক্ষা বলে কথিত প্রাতিষ্ঠানিক সনদ অর্জন করতে সক্ষম হলে যা হয় তা হলো মিয়া মুহম্মদ আবু জুনায়েদ এবং প্রমুখ।'[৩৭] রাজনীতি ও সংস্কৃতির যে সংকট বিদ্যমান ছিল পাকিস্ড়ানি ঔপনিবেশিক শাসনামলে, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ সত্ত্বেও সে সংকট দূরীভূত হয়নি। তা নতুন রূপে, নতুন মাত্রায় সমাজ জীবনে বিরাজ করছে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি সরকার ক্ষমতার মোহে ধর্মীয় রাজনীতিকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছে। *গাভী বৃত্তান্ড়* উপন্যাসে নব্বই দশকের প্রেক্ষাপটে দেশের সর্ব্বোচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভ্য বলে কথিত কর্তাব্যক্তিদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও অসংস্কৃত জীবনযাপনের চিত্র উঠে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিম লে বসবাসকারী প্রতিক্রিয়াশীল, মৌলবাদী শিক্ষকদের নানামুখী তৎপরতার বিবরণ আছে এই উপন্যাসে। আহমদ ছফা একটি সেক্যুলার রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু ধর্মীয় রাজনীতি আমাদের সমাজকে এমনভাবে বেষ্টন করে রেখেছে যে, সেক্যুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমস্ড় প্রত্যয় মুখ বুজে থাকতে বাধ্য হয়েছে। এ সমস্যাটিকে চিহ্নিত করে আহমদ ছফা লেখেন :

> এ দেশের প্রায় আশি শতাংশের মত মানুষ মুসলমান। শুধু আশি শতাংশ নয়, শতকরা একশ' ভাগ মুসলমানও যদি এ দেশে বসবাস করে থাকে তারপরেও আমাদেরকে একটি সেক্যুলার সমাজ, একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র তৈরি করার চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করতে হবে। যে দেশটির শতকরা আশিভাগ মানুষ মুসলমান এবং যে দেশের মুসলমানেরা অধিকাংশই ধর্মপ্রাণ ও মধ্যযুগীয় চিন্ড়-চেতনায় আচ্ছন্ন, সেই বিশাল জনগোষ্ঠীকে একটি সেক্যুলার সমাজ গঠন করার দিকে আকর্ষণ করতে গেলে যে ধরনের প্রজ্ঞা এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের রাজনীতি যারা নিয়ন্ত্রন করছে তাদের ভেতর সেরকম মেধা এবং রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণাবলী সম্পন্ন একজন মানুষের দেখাও পাওয়া যাচ্ছে না। এখানেই আমাদের আসল দুঃখ।[৩৮]

বাংলাদেশের রাজনীতিকদের ধর্মীয় উম্মাদনা, সাম্প্রদায়িক মনোভাব সর্বক্ষেত্রে বিরাজিত। ধর্মীয় রাজনীতির সর্বগ্রাসী থাবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আবহাওয়াকেও দুষিত করে ফেলেছে। রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করায় সাংস্কৃতিক পরিম লে কলুষিত হয়ে পড়ে। ফলে সরকার নিয়ন্ত্রিত দেশের সর্ব্বোচ বিদ্যাপিঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিরাও রাজনীতিকদের সুরে কণ্ঠ মেলান। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিষিদ্ধ করা হয় পূর্ব বাংলায়। সাংস্কৃতিক নিপীড়নের বির দ্ধে পূর্ব পূর্ব বাংলার জনগণ সে

সময় প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্ড়ানের ধর্মীয় রাষ্ট্র কাঠামো থেকে রেরিয়ে এসে স্বাধীন বাংলাদেশে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ হওয়ার কথা থাকলেও ধর্মীয় রাজনীতির প্রভাবে তা সম্ভব হয়নি। *গাভী বৃত্তান্ড়* উপন্যাসে তা প্রতিফলিত হয়েছে। নব্বই দশকে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে কথিত বুদ্ধিজীবীদের কর্মকা- আমাদের মুক্ত বিবেককে দংশন করে। *গাভী বৃত্তান্ড়* উপন্যাসে দেখতে পাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবু জুনায়েদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে কটুক্তি করতে দ্বিধা করেননি। উপাচার্য আবু জুনায়েদ একটি কবিতা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেছেন:

> কাজী নজর-ল ইসলাম যদি দীর্ঘকাল সুস্থ থাকতে পারতেন তিনিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নোবেল প্রাইজটি পেয়ে যেতেন। হিন্দুরা ষড়যন্ত্র করে নজর-লের মাথাটি খারাপ করে দিয়েছিল, তাই তার ভাগ্যে নোবেল পুরস্কারটি জোটেনি।[৩৯]

আহমদ ছফার মতে, 'এই বাংলাদেশে যেখানে শতকরা আশিজন মানুষ মুসলমান - আশিজনের মধ্যে ঊনসত্তর জন সংস্কারান্ধ।'[৪০] উপাচার্য আবু জুনায়েদ সেই অন্ধবিশ্বাসী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সাম্প্রদায়িক চেতনাধারীদের একজন। শুধু যে আবু জুনায়েদ রবীন্দ্র-নজর-ল বিতর্কে মুখে ফেনা তুলেছেন তা নয়। মসজিদে নামাজ শেষে 'চার পাঁচজন মুসলণ্ডী একসঙ্গে কবিতা সম্মেলনে নজর-ল ইসলাম সম্পর্কিত একেবারে বৈজ্ঞানিক সত্যটি (অর্থাৎ হিন্দুরা তার মাথাটি খারাপ করে দিয়েছিল) প্রকাশ করার জন্য একসঙ্গে ধন্যবাদ জানালেন। ফার্সি ভাষার শিক্ষক (যে বিষয়ে একজনও ছাত্র নেই) মাওলানা আবদুর রহমান তালিব দাঁড়িয়ে তার হস্ড় চুম্বন করলেন এবং প্রকাশ্যে আলিঙ্গন দান করলেন।'[৪১] তারা সবাই উপাচার্যকে পরহেজগার এবং ইসলামের খেদমতকারী হিসেবে অভিহিত করলেন। সাথে সাথে ফার্সি ভাষার শিক্ষক আবদুর রহমান তালিব এটাও বললেন :

> রামনাথ ছাত্রাবাসে হিন্দুরা বিবেকানন্দ না কোন একজন হিন্দুর মূর্তি তৈরি করেছে। এ ধরনের কাজ ব্রিটিশ আমলে সম্ভব হয়নি, পাকিস্ড়ান আমলে সম্ভব হয়নি। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে যেখানে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম বিবেকানন্দ বাবুর পাথুরে মূর্তি বহাল তবিয়তে তৈরি হয়ে গেছে। এটা কি একটা ষড়যন্ত্রমূলক কাজ নয়?[৪২]

এ বিষয়ে উলেণ্ডখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে ১৯৯৪ সালের ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি নির্মাণ কাজের ভিত্তি স্থাপন করেন এমাজউদ্দীন আহমেদ এবং একই সালের ২০ মে কবি সুফিয়া কামাল এটি উদ্বোধন করেন। স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির ভাস্কর ছিলেন শামীম শিকদার। মাওলানা আবদুর রহমান তালিব বলেছেন:

> মালাউনদের চক্রান্ড়টি ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। একটি মুসলিম মহিলাকে দিয়ে মূর্তিটি তৈরি করিয়ে আপনাকে দিয়ে উদ্বোধন করালো, এখানেই চক্রান্ড়ের খেলায় আমরা হেরে গেলাম। মূর্তি নির্মাণের টাকাটি দিয়েছে গোপনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।[৪৩]

স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি তৈরি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক মুসলিম শিক্ষকদের মধ্যে যে বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি সে সম্পর্কে লেখক অন্যত্র বলেছেন:

> স্বামী বিবেকানন্দের অন্য অনেক পরিচয় যাই থাকুক, তাঁর ধর্মীয় পরিচয়টাই তাঁর অন্যবিধ পরিচয়কে ছাপিয়ে উঠেছে। ঘোষিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিবেকানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় না। কিন্তু এখানে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হলো, তখনই মুসলিম শিক্ষকদের কেউ কেউ অগ্রণী হয়ে প্রস্ড়াব তুললেন সলিমুলণ্ডাহ মুসলিম হল এবং ফজলুল হক মুসলিম হল নতুন করে নামকরণ করা হোক। আরেক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম পাল্টানোর প্রস্ড়াব করলেন। প্রতিটি ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটিও অপ্রিয় বাক্য বিনিময় ছাড়া একটি সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় থেকে কতোদূরে সরে যাচ্ছে, এই সকল ঘটনার মধ্যে তার প্রমাণ মেলে।[৪৪]

উপন্যাসেও দেখা যায় বিবেকানন্দের মূর্তি উচ্ছেদ, হলের নাম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম পরিবর্তনের জন্য প্ররোচিত করা হয়েছে উপাচার্য আবু জুনায়েদকে, দেশের বিবেক বলে পরিচিত জ্ঞান চর্চার এই কেন্দ্রটিকে ঘিরে হিন্দু-মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক চিন্ড়া-ভাবনার বাস্ড়ব রূপায়ণ *গাভী বৃত্তান্ড়* উপন্যাস।

আহমদ ছফার উপন্যাসের নিবিড় পাঠে দেখা যায় 'সুস্থ সংস্কৃতি'র অভাবজনিত সংকটকে তিনি সকল সংকটের কারণ হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। 'বাংলাদেশের ধর্মীয় উম্মাদনা ও ধর্মীয় ফ্যাসিবাদকে তিনি আঘাত হানেন প্রচ- বিদ্রূপে। কেবল খ্যাতিমান হওয়ার মতলবে শিল্পমানশূন্য নিচু র-চির বই সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতার নামে নিজের দেশবাসীকে ছোটো করে, তখনও সেই অসৎ তৎপরতাকে তিনি এতোটুকু ছাড় দেন না; ব্যঙ্গ বিদ্র-পে ও তিরস্কারে জর্জরিত করে তোলেন তাকে। আঘাত করার জন্য কৌতুক প্রয়োগে তাঁর নৈপুণ্য বাঙলা সাহিত্যে বিরল।'[৪৫] বাংলাদেশের মানুষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য স্বপ্ন দেখে এসেছে ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই। সে জন্য বাঙালিরা একের পর এক সংগ্রাম ও আন্দোলন করেছে। অশুভ শক্তির বির-দ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে বারবার তাঁদের সামনে সুযোগ এসেছে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাদের স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছে। আন্দোলন-সংগ্রামের বিজয়কে ম্ড়ান করে দিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অপতৎপরতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বির-দ্ধে, ধর্মনিরপেক্ষ উদার ধারার বির-দ্ধে, আধুনিক চিন্ড়া ও বাঙালি সংস্কৃতির বির-দ্ধে যারা বারবার ষড়যন্ত্র করেছে শেষ পর্যন্ড় জয় হয়েছে তাদের। হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছে বাঙালি জাতি। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম ব্যবসায় ও ধর্মীয় রাজনীতি পাকাপোক্ত আসন করে নিয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রের বুকে। আহমদ ছফা এই বিষয়টিকেই তাঁর কথাসাহিত্যে ভাষারূপ দিয়েছেন।

তথ্য নির্দেশিকা

১ বদর-দ্দীন উমর, *সাম্প্রদায়িকতা*, পঞ্চম সং. (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৭), পৃ. ১৪।
২ *তদেব*, পৃ. ১৪।
৩ *তদেব*, পৃ. ২৬।
৪ *তদেব*।
৫ আহমদ ছফা, "সাম্প্রতিক বিবেচনা: বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস," *আহমদ ছফা রচনাবলী*-২, ১ম সং. (ঢাকা: সন্দেশ, ২০০১), পৃ. ২২৩।
৬ *তদেব*, পৃ. ১৮৭।

[৭] *তদেব*, পৃ. ১৯৯।
[৮] *তদেব*।
[৯] শহীদ ইকবাল, *রাজনৈতিক চেতনা: বাংলাদেশের উপন্যাস*, ১ম সং. (ঢাকা: সাহিত্যিকা, ২০০৩), পৃ. ৩৭।
[১০] আহমদ ছফা, "সাম্প্রতিক বিবেচনা: বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭।
[১১] ড. বদিউজ্জামান, *সাম্প্রদায়িকতা দুর্বিনীত উত্তরাধিকারে*, ১ম সং. (ঢাকা: সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, ২০০১), পৃ. ১৬৯।
[১২] আহমদ ছফা, "সূর্য তুমি সাথী", *আহমদ ছফা রচনাবলী*-২, ১ম সং. (ঢাকা: সন্দেশ, ২০০১), পৃ. ৭৫।
[১৩] *তদেব*, পৃ. ১২১।
[১৪] *তদেব*, পৃ. ৯০।
[১৫] *তদেব*, পৃ. ১৩৯।
[১৬] *তদেব*, পৃ. ১২০।
[১৭] *তদেব*, পৃ. ১৫৭।
[১৮] *তদেব*, পৃ. ১২৯।
[১৯] *তদেব*, পৃ. ১২৯।
[২০] আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *আহমদ ছফার পাঁচটি উপন্যাস*, ১ম সং. (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ) পৃ. ভূমিকাংশ।
[২১] আহমদ ছফা, *একজন আলি কেনানের উত্থান*-পতন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪।
[২২] *তদেব*, পৃ. ৩০।
[২৩] *তদেব*, পৃ. ৩৬।
[২৪] মহীবুল আজিজ, "আহমদ ছফা; তাঁর সাহিত্যিক অনুসন্ধিৎসা", *আহমদ ছফা স্মারক গ্রন্থ*, ১ম সং. (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩), পৃ. ৩৩৩।
[২৫] আহমদ ছফা, *একজন আলি কেনানের উত্থান*-পতন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬।
[২৬] মহীবুল আজিজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩৩।
[২৭] আহমদ ছফা, *একজন আলি কেনানের উত্থান*-পতন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩।
[২৮] *তদেব*।
[২৯] *তদেব*, পৃ. ৬৫।
[৩০] আহমদ ছফা, "সাম্প্রতিক বিবেচনা: বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৩।
[৩১] আহমদ ছফা, *একজন আলি কেনানের উত্থান*-পতন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫।
[৩২] মহীবুল আজিজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩৩।
[৩৩] আহমদ ছফা, *একজন আলি কেনানের উত্থান*-পতন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩।
[৩৪] *তদেব*, পৃ. ৩৪।
[৩৫] *তদেব*, পৃ. ৫৮।
[৩৬] আহমদ ছফা, "সাম্প্রতিক বিবেচনা: বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫০।
[৩৭] মহীবুল আজিজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩৩।
[৩৮] আহমদ ছফা, *বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র*, ১ম সং. (ঢাকা: শ্রীপ্রকাশ, ২০০১), পৃ. ১৬-১৭।
[৩৯] আহমদ ছফা, "গাভী বৃত্তান্ড়" *আহমদ ছফা রচনাবলী-৪*, ১ম সং. (ঢাকা: সন্দেশ, ২০০৩), পৃ. ২২৭।
[৪০] আহমদ ছফা, "সাম্প্রতিক বিবেচনা: বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪৭।
[৪১] আহমদ ছফা, "গাভী বৃত্তান্ড়" *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৮।
[৪২] *তদেব*, পৃ. ২২৯।
[৪৩] *তদেব*, পৃ. ২২৯।
[৪৪] আহমদ ছফা, "সাম্প্রতিক বিবেচনা: বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৭।
[৪৫] আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ভূমিকাংশ।